সংবাদ

তারিখ ...... 1 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

ফিচার

প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশে উপবৃত্তি কতটা কার্যকর?

লুৎফুন নাহার

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম লক্ষ্মীপুর। এই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী আয়েশা। স্কুলে যাওয়ার পাশাপাশি তাকে সংসারের বিভিন্ন কাজে তার মাকে সাহায্য করতে হয়। এজন্য প্রতিদিন সে স্কুলে যেতে পারে না। আবার কখনও কখনও স্কুলে পৌছতে দেরি হয়। তারপরও সে স্কুলে যায়। লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে নয়, উপবৃত্তির জন্য।

আয়েশার বাবা আবদুল হালিম বলেন, এত স্কুলে যাইয়া কি হইব? মাইয়া তো বিয়া দিতে হইব। এহন কিছু টাকা পায় দেইখা স্কুলে পাঠাই।

একই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্রী সালমা নিয়মিত স্কুলে গেলেও এখনও ঠিকমতো লিখতে পড়তে পারে না। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারের সন্তান সালমার বাবা-মা দু'জনেই অশিক্ষিত। সংসার চালানোই যেখানে তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার সেখানে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খোঁজ রাখার সময় তাদের কোথায়। তাদের আগ্রহ শুধুমাত্র উপবৃত্তির টাকার উপর।

একই গ্রামের দশ বছরের আরিফকে এই বয়সেই বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করতে হয়। প্রায় সময়ই তার স্কুলে যাওয়া হয় না। আবার বাড়তি আয়ের জন্য তাকে একটি দোকানে কাজ করতে হয়। এত দিক সামলিয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখা আর হয়ে ওঠে না। তারপরও উপবৃত্তির টাকার জন্য মাঝে মাঝে স্কুলে যেতে হয়।

এটা শুধু এই বিদ্যালয়ের চিত্র নয়, বাংলাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রই এরকম। লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা লায়লা ইসলাম বললেন, 'গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া এই অল্প কিছু টাকাই তাদের কাছে অনেক বেশি। এই টাকার জন্য তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়। পড়ালেখা ঠিকমতো করছে কিনা এ ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তা নেই। এছাড়া মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা একটা বড় কারণ। মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে পারলে মা-বাবা নিশ্চিন্ত হন। যদিও বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তারপরও শিক্ষার চেয়ে টাকাটাই তাদের কাছে মুখ্য বিষয়।'

নাটোরের কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা আসমা খাতুন বললেন, 'শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও শিক্ষার মান সে অনুযায়ী বাড়েনি। এজন্য গ্রামের স্কুলের শিক্ষার্থীরা বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে পিছিয়ে পড়ছে। শহর এবং গ্রামের শিক্ষার মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিস্তর ফারাক।'

ঝালকাঠি জেলার সরমহল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বললেন, 'ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবক কেউই সচেতন নন। বাবা-মায়ের দাবি, উপবৃত্তির টাকা দিতে হবে। টাকা দেয়ার জন্য অনেক সময়ই তাদের পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়া হয় এবং স্কুলে উপস্থিতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়।'

সিরাজগঞ্জের কলাগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ক্লাসরুমগুলো প্রায় ফাঁকা। টিচার্স রুমে কিছু শিক্ষক বসে গল্প করছেন। তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, প্রতিদিনের চিত্রই এরকম। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ঘরের, ক্ষেতের কাজের জন্য ঠিকমতো স্কুলে আসে না। অথচ এই স্কুলের এক শ' ভাগ শিক্ষার্থীর নামেই উপবৃত্তি চালু আছে।

বগুড়ার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বললেন, 'আমাদের স্কুলে উপবৃত্তির টাকা যথাযথভাবেই দেয়া হয় এবং পাসের হার ও ভাল। কিন্তু সার্বিক বিচারে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা খুবই করুণ। দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, অভিভাবকদের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এছাড়া শিক্ষার মান ও পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে।'

১৯৯০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার বাড়ানো এবং ঝরে পড়া রোধে নব্বই পরবর্তী সময়ে প্রধান কর্মসূচি ছিল শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য। ২০০১ সালে এই কর্মসূচি বাতিল করে ২০০২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর উপবৃত্তি বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর এবং ৮৫ ভাগ উপস্থিতির ভিত্তিতে টাকা দেয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ মাসে ১০০ টাকা। শুরুতে সরকার এই কর্মসূচির জন্য ৬ শ' কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়, যা আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত চলবে।

বিভিন্ন সরকার আমলে অনেক পদক্ষেপ নেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার হার বাড়েনি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৭ লাখ ৭৮ হাজার ৫ শ' ৫৫ জন। ২০০৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার ৪ শ' ৫৬ জন।

বছর বছর ছাত্রছাত্রী কমে যাওয়ার পিছনে রয়েছে বিভিন্ন কারণ। উপবৃত্তির টাকা যথানিয়মে বণ্টন করা হয় কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ম্যানেজিং কমিটি প্রায় সময়ই টাকা দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম করে। গরিব ও মেধাবী ছাত্রের পরিবর্তে যাদের অবস্থা ভাল তাদের টাকা দেয়। ফলে গরিব ছেলেমেয়ে স্কুলে আসার ব্যাপারে আরও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এ ব্যাপারে কমিটি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তারা কথা বলতে অস্বীকার করে।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কোন পদক্ষেপ নেয় কিনা জিজ্ঞেস করা হলে একজন কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বললেন, 'আমাদের কাছে এরকম কোন অভিযোগ আসলে তদন্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রয়োজনে শিক্ষকদেরও অপসারণ করা হয়ে থাকে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বললেন, 'উপবৃত্তি একটি সংস্কারমূলক পদ্ধতি। এর ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। তাই এটা বন্ধ করা যাবে না। তাহলে দরিদ্র পিতামাতারা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে আরও আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য উপবৃত্তির পাশাপাশি রাষ্ট্রকে যুগপোযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে উপবৃত্তির পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয়া যায়। তিনি আরও বললেন, শিক্ষার প্রতি বাচ্চাদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। পড়ালেখাটা তাদের কাছে আনন্দময় করে তুলতে হবে। তাহলে বাচ্চারা আগ্রহভরে স্কুলে আসবে। এজন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নজরুল ইসলাম খান এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, নিম্নমানের অবৈতনিক শিক্ষা মেয়েদের স্কুল-কলেজে ধরে রাখতে পারছে না। মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের মানসম্মত শিক্ষা দেয়া এবং পড়ালেখায় ধরে রাখা। ভর্তির হার বাড়লে ঝড়ে পড়ার হারও বাড়ে। উপবৃত্তি দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার বাড়ানো হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে হলে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। উপবৃত্তির টাকাটা অভিভাবকদের হাতে যায়। এজন্য শিশুদের পড়ালেখায় আকৃষ্ট করার জন্য আধুনিক উপায়ে শিক্ষা দিতে হবে।

যে কোন দেশের উন্নয়নের মূল শর্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। আর শিক্ষার ভিত্তিটা যদি ভাল না হয় তাহলে পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়তে শুরু করে। এ জন্য শিক্ষার মান বাড়াতে হবে এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন করতে হবে। বর্তমান সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার করেছে। বাস্তবে এর কতটুকু প্রতিফলন ঘটে সেটাই এখন দেখার বিষয়। নিউজ নেটওয়ার্ক।